অতি বর্ষণে ফুলচাষে ক্ষতি

তপনকুমার বিশ্বাস

প্রথমে অসহ্য গরম এবং প্রখর রৌদ্রে জমি ফুটিফাটা হয়ে ফুলের চারা প্রায় অর্ধেক মরে গিয়েছিল। এরপর প্রবল বর্ষা এবং বন্যায় জমি প্লাবিত হয়ে যায়। গোড়ায় জল জমে গিয়ে গাছ ঢলে যায়। গোড়াপচা রোগ শুরু হয় জলের জন্য। ফলে উত্তর দিনাজপুর জেলার যে অংশে বেশি ফুলচাষ হয়, সেই গাছ প্রায় ৮০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যার ফলে রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরের ফুলবাজারে ফুলের দাম প্রায় ১৫ গুণ বেড়ে গিয়েছে। এর প্রভাব বাঙালির সবথেকে বড়ো পার্বণ দুর্গাপুজোয় অবধারিতভাবে পড়বে বলে চাষি এবং ফুল ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা। সূর্যাপুরের ফুলচাষি শচীন বিশ্বাস বলেন, আমি ৫ হাজার গাঁদা ফুলের গাছের চারা বসিয়েছিলাম। তার মধ্যে মাত্র ১০০ ফুলগাছ বেঁচে আছে। বাকি সব প্রথমে রোদ গরমে এবং পরে অতিবৃষ্টি আর বন্যায় জল জমে গোড়াপচা রোগে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার মতো সমস্ত ফুলচাষিরই এক অবস্থা। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বালুরবাঁধ, সূর্যাপুর, কমলপুর, হাসান এবং গোয়ালপোখর-১ ব্লকের শান্তিনগর এলাকায় ব্যাপক হারে ফুলচাষ হয়। শচীনবাবু বলেন, আমরা রায়গঞ্জ, ইসলামপুর এমনকি শিলিগুড়ির বাজারে ফুল নিয়ে যাই। আমাদের ফুলের জোগান কমে ১০ ভাগের একভাগ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ফুলের দাম একধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে। পরিবেশ অনুকূল না হলে এর প্রভাব পুজোয় পড়বেই।

ইসলামপুরের ফুল ব্যবসায়ীরা বলেন, নিত্যপুজোয় ফুলের উপর কোপটা পড়েছে। যার ফলে সবরকম গাঁদা, দোপাটি, অপরাজিতা অর্থাৎ ঝুরো ফুলের দাম বেড়েছে মারাত্মকভাবে। জেলার গোয়ালপোখর-১ ও ২ ব্লকের ফুলচাষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে ইসলামপুরের ডিমরুল্লা, গড়হনডাঙ্গা, ঘোড়ামরা, চোপড়াঝাড় এলাকায় বৃষ্টি হলেও বন্যা না হওয়ায় সেভাবে প্রভাব পড়েনি। সম্প্রতি বেল, জুঁই, গোলাপ, রজনিগন্ধা এবং পদ্মফুলেরও দাম বেড়েছে। কিন্তু পদ্মচাষ এই বর্ষার জন্য ভালোই হবে বলে আশা ফুলচাষিদের। এখন নতুন করে চাষ করা গেলেও পুজোর সময় ফুলের বাজারে নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব। আর নতুন করে চাষ করার অনুকূল পরিবেশ এখনও হয়নি। কবে হবে তাও বলা যাচ্ছে না। একদিকে বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেছে, তারপর প্রায় রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। ফুলচাষের জমি কোথাও ডুবে আছে, কোথাও জলকাদায় মাটি নরম হয়ে আছে। জেলা উদ্যানপালন বিভাগের আধিকারিক দীপক সরকার জানান, এবারের বন্যায় জেলার ফুলচাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে গাঁদা ও রজনিগন্ধা ফুলের জমি ক্ষতি হয়েছে। এখন নতুন করে চারা পুঁতলে পুজোয় ফুল পাওয়া যাবে না। ফুলচাষিদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তেজপাতার তেজ উত্তরের কৃষিতে

জ্যোতি সরকার

উত্তরের কৃষিতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে তেজপাতা। তেজপাতার চাষে বেশি উৎসাহ পাচ্ছেন কৃষকরা। কারণ তেজপাতার বিপণনে একাধারে যেমন কোনো সমস্যা নেই তেমনি লাভজনক মূল্য পাওয়া যাচ্ছে। মোহিতনগরস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার এবং রাজ্য কৃষি দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তরবঙ্গ হল তেজপাতা চাষের আদর্শ জায়গা। এই চাষের এলাকা ক্রমবর্ধমান। বিশেষত উত্তরদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার পাশাপাশি পাহাড় সংলগ্ন এলাকাতে তেজপাতা চাষের প্রসার ঘটছে। উত্তরবঙ্গের ছোটো চা বাগানের সংখ্যাও বাড়ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিরা চা বাগানের ধারে তেজপাতার গাছ লাগাচ্ছেন। এই গাছ যেমন চা গাছকে ছায়া দিচ্ছে তেমনি তেজপাতা বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। উন্নত জাতের তেজপাতা গাছের চারা মোহিত নগরে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে চারা গাছ তৈরির কাজে নিয়োজিত কৃষি শ্রমিকরা। প্রগতিশীল চাষিরা মোহিত নগর থেকে তেজপাতার চারা সংগ্রহ করছেন। কৃষি বিজ্ঞানী অরুণকুমার শীট জানালেন, মোহিত নগর ফার্মে তেজপাতার চাষ করে যথেষ্টই সাফল্য পাওয়া গেছে। এই সফল্যের শরিক তাঁরা উত্তরের কৃষকদের করতে বিশেষ আগ্রহী। ইতিমধ্যেই মোহিত নগরে কৃষি মেলা হয়েছে। এই মেলাতে অন্যান্য চাষের সঙ্গে তেজপাতা চাষের বিষয়ে তাঁরা চাষিদের পরামর্শ দিয়েছেন। ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে চাষিরা প্রচুর তেজপাতা গাছ লাগিয়েছেন। একই জমি থেকে দুটি ফসলের সুফল পাচ্ছেন কৃষকরা।

প্রগতিশীল তেজপাতা চাষি পরিমল মল্লিক জানালেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তেজপাতার চাষ করছেন যেমন তেমনি কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করছেন। পরিমলবাবু জানালেন তেজপাতা গাছ লাগানোর তিন বছর সময়ের মধ্যেই পাতা পাওয়া যায়। বাজারে তেজপাতার চাহিদাও যথেষ্ট। উত্তরবঙ্গের তেজপাতা কলকাতার পাশাপাশি পাটনা, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যায়। আভন্তরীণ বাজারে তেজপাতার চাহিদা পূরণে উত্তরবঙ্গের অবদান অনেকখানি। উত্তরের তেজপাতা রপ্তানিও হয়। প্রতিবেশী দেশগুলিতে এখানকার তেজপাতা বিপণন করা হয়। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চাষিরা তেজপাতা চাষে শামিল হওয়াতে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে। বলা যেতেই পারে তেজপাতার তেজে বলিয়ান উত্তরের অর্থনীতি।

ছবি ঃ প্রতিবেদক

বাড়তি জমি ছাড়াই

‘কালো সোনা’ চাষ করার উপায়

কুণাল নন্দী

কালো সোনা বা ব্ল্যাক গোল্ডকেই আমরা গোলমরিচ বলে থাকি। মশলা হিসেবে দেশে ও বিদেশে এর চাহিদা যথেষ্ট আছে। খাদ্যসামগ্রীকে নানা স্বাদে গন্ধে আকর্ষণীয় করতে এর যথেষ্ট ব্যবহার হয়ে আসছে। এর বাজারদরও নেহাত কম নয়। এটি নানাপ্রকার ঔষধিগুণে ভরপুর। এত চাহিদা ও গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও এই কালো সোনা চাষের দিকে কৃষকদের বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ে না। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার কিছু এলাকায় এর চাষ হয়ে থাকে।

গোলমরিচ চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াযুক্ত ২০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ২০০-৩০০ মিলিমিটার গড় বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকা উপযুক্ত এবং মাটির পিএইচ ৪.৫-৬ পর্যন্ত হলেই চলবে। এই আবহাওয়ার সঙ্গে উত্তরের তরাই এলাকার জেলাগুলিতে গোলমরিচ চাষের সামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজেই এই এলাকায় এর চাষ বাড়াতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কৃষকদের আগ্রহ বাড়ানো দরকার। এই এলাকাগুলোতে গোলমরিচ চাষের জন্য আরও একটি বাড়তি সুবিধা আছে। অতিরিক্ত কোনো জমিকে ব্যবহার না করেই সাথি ফসল হিসেবে এর চাষ করার অনেক সুযোগও অছে। কারণ, এই জেলাগুলিতে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু কিছু নারকেল ও সুপারি গাছ আছে। কোনো কোনো জায়গায় বেশকিছু সুপারি বাগানও চোখে পড়ে। এই সমস্ত এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে, অন্য কোন জমিকে ব্যবহার না করেও ওই সুপারির সঙ্গে খুব সহজেই এই কালো সোনা বা গোলমরিচের চাষ করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে নারকেল বা সুপারি গাছের গোড়া থেকে ২-৩ ফুট দূরত্বে ৫০x৫০ সেন্টিমিটার গর্ত করে ভালোভাবে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে প্রতি গর্তে ৩ কেজি পরিমাণ জৈব সার, ২৫০ গ্রাম সিঙ্গিল সুপার ফসফেট, ১৫ গ্রাম কার্বফুরান দানা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার উন্নত জাতের গাছের গোড়া থেকে বের হওয়া লতা কাটিং করে ওই গর্তে বর্ষার শুরুতেই বসিয়ে দিতে হবে।

উন্নত জাতগুলির মধ্যে কালুভেলি, পন্নিয়ুর-১, কোট্টাভেলি এগুলি ভালো। কাটিং বসাবার পর ওই কাটিং-এর গোড়া থেকে বাঁশের ডগা বা রশি লাগিয়ে গাছে ওঠার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রথম বছর সরাসরি বেশি রোদ যাতে না লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষার পর আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি গাছের গোড়ায় ২ ঝুড়ি জৈব সার মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর তৃতীয় বছর থেকে প্রতি গাছের গোড়ায় ২ ঝুড়ি জৈব সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম সিঙ্গিল সুপার ফসফেট, ২২৫ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ মিশিয়ে দিতে হবে।

এই গোলমরিচে সাধারণত ডাঁটা ছিদ্রকারী পোকা, চোষীপোকা, আঁশপোকা, দয়েপোকার আক্রমণ হতে পারে। এর জন্য নিয়মিত নিমতেল ব্যবহার করলে বা তামাক পাতার রস ব্যবহারে আক্রমণ হতে পারে না। এছাড়াও রাসায়নিক কীটনাশক হিসেবে প্রফেনোফস্ জাতীয় ঔষধ প্রতি লিটার জলে ১.৫ মিলি গুলে স্প্রে করেও রক্ষা করা যায়।

এছাড়াও কিছু রোগ দেখা দিতে পারে, যেমন- হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়া, পাতা পচা, গাছ থেকে রস চুইয়ে পড়া- এগুলি থেকে রেহাই পেতে প্রতি গাছে ২৫ গ্রাম করে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসেবে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করে এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সবসময় মনে রাখতে হবে যে ফল পাকার এক মাস আগে থেকেই সমস্ত রকম রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে খুব সহজেই কালো সোনার চাষ করা সম্ভব।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

শুষনি

বহুবর্ষজীবী চওড়া পাতা ফার্ন। জলাভূমির লতানে আগাছা। একটি পাতার চারটি পত্রাংশ থাকে। মাটিতে এদের রাইজোমই শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। স্পোর জোড়ায় জোড়ায় থাকে। রাইজোম, শিকড়, স্পোরোর মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। ধানখেতে ও জলাভূমিতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ ১) গ্রীষ্মকালীন গভীর লাঙ্গল দিলে ও রাইজোম রোদে শুকিয়ে যায়। ২) হাত নিড়ানও কার্যকর। ৩) ধান জমিতে প্রয়োগ করা আগাছানাশক পাইরাজো সালফুরন/পেন্ডিমেথালিন/সিনমিথালিন/প্রটিলাক্লোর প্রয়োগ কার্যকরী।

লতাফুটকি

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। উচ্ছে গাছের মতো দেখতে লতানে গাছ, আকর্ষককে অবলম্বন করে জড়িয়ে উপরে ওঠে। পাতার গোড়া থেকে হলদেটে ফুল ফোটে। ফল বেলুনের মতো ফাঁপা আবরণের মধ্যে থাকে। এপ্রিল-জানুয়ারি মাসে ফল-ফুল ধরে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। রাস্তার পাশে ঝোপে জঙ্গলে দেখা যায়।

পোকার আক্রমণে জেরবার কৃষকেরা

ধূপগুড়ি ব্লক

শুভাশিস বসাক

বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এবার নতুন করে আমন ধানে পোকা ও রোগের আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন কৃষকরা। ধূপগুড়ি ব্লকজুড়েই নতুন করে সমস্যা দেখা দিতে পারে অনুমান করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরাও। তবে গোটা পরিস্থিতির ওপর কৃষি বিশেষজ্ঞরা নজরদারি চালাচ্ছেন বলেও কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লক কৃষি বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। একাধারে যেমন সবজি চাষে ক্ষতি হয়েছে, তেমনই আমন ধানেও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। এই মুহূর্তে ধান গাছে বাদামি শোষক পোকা ও মাজরা পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। পাশাপাশি দুই ধরনের রোগ যেমন ঝলসা ও খোলা পচা রোগে আক্রান্ত হতে পারে আমন ধানের গাছগুলি। বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকদের কথায়, কিছু জমিতে ধানের শিস ঝলসে গিয়েছে। আবার কোথাও পোকার আক্রমণও ঘটেছে। বিষয়টি কৃষি প্রযুক্তি সহায়ককে জানানো হয়েছে। বেশকিছু কীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শও দিয়েছেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাদামি শোষক পোকা ও মাজরা পোকা কিছুদিনের ব্যবধানে ধান গাছে ক্ষতি করে। ফলে গাছের পাশকাঠি কমে যায় এবং বৃদ্ধি থমকে যায়। একইসঙ্গে ফসল পাকার পর ধানের উৎপাদনও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়। একইভাবে দুটি রোগ ঝলসা ও খোলা পচা রোগে ধান গাছ আক্রান্ত হয়ে উৎপাদন কমিয়ে দেয়। গাছের কাণ্ডগুলি পচিয়ে দেয় এবং পাতাগুলিও ঝলসে যায়। ব্লকজুড়েই এই সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই সহকৃষি অধিকর্তা ডঃ দেবাশিস সর্দার ব্লকের সমস্ত কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের গ্রাম পঞ্চায়েত ও মৌজা স্তরে ঘুরে ধান গাছের জমিগুলিতে নজরদারি করতে বলছেন। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি তথা ভারী বৃষ্টি কমার পরও জমিতে জল জমার পরই ধীরে ধীরে ধান গাছগুলি নানা রোগ ও পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে নানা কীটনাশক প্রয়োগ সহ বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারিভাবেও বিভিন্ন কীটনাশক সরাসরি কৃষকদের সরবরাহ করা হচ্ছে।

একইভাবে ধান গাছ রক্ষা করতে এবং কৃষকদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের জন্যে পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লক

তপন আইচ

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বহু এলাকায় ব্যাপক হারে লেদাপোকার আক্রমণে জেরবার এলাকার কৃষকেরা। বেশ কিছুদিন হল এই পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে বলে এলাকার কৃষকেরা অভিযোগ করেন।

কৃষকেরা জানান, সদ্য বন্যায় বিঘার পর বিঘা জমিতে জল জমে ধানের চারা পচে গিয়েছে। তারপরও যা বাঁচানো গিয়েছে, সেগুলিই ছিল অনেকের শেষ ভরসা। কিন্তু হঠাৎ করে লেদাপোকার আক্রমণে চিন্তায় চাষিরা। অতিদ্রুত পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারলে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে যাবে বলে কৃষকেরা আশঙ্কা করছেন। এব্যাপারে ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা ঋতম দাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, বিষয়টি তাঁদের গোচরে আছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে ব্লকের ১১টির মধ্যে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৫০০০ হেক্টরের মধ্যে ৩৮০০ হেক্টর ধান চাষে লেদাপোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে। এব্যাপারে তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানোর পাশাপাশি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অভিযানে নেমেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে কৃষকদের সচেতন করতে লিফলেট বিলি করছেন। অপরদিকে তিনি এবং কোচবিহার সদরের এডিএ (বিষয়বস্তু) তপন মান্তা সহ ব্লকের কেপিএসরা মিলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘুরছেন ও কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। ঋতমবাবু বলেন, পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে প্রথমে কীটনাশক প্রয়োগ না করে পাখিদের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য বিঘা প্রতি জমিতে ৪-৫ টি করে বাঁশের কঞ্চির ঝাড় লাগাতে হবে, যাতে পাখিরা সেখানে এসে বসে। কারণ পাখিদের প্রিয় খাদ্য এই পোকা। কিন্তু প্রথমেই কীটনাশক প্রয়োগ করলে কোনো পাখি সেখানে এসে বসবে না। ৪-৫ দিনে পাখিরা বেশিরভাগ পোকা খেয়ে ফেললেও অনেক পোকা ভেতরে থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে ৪-৫ দিন পর ক্লোরোপাইরিফর্ম জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার জলে আড়াই লিটার গুলে অথবা লেমডাসাইনি হেলোস্পিন জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার জলে ০.৫ মিলি গুলে জমিতে সকাল বা সন্ধ্যায় স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ কমতে পারে বলে ঋতমবাবু কৃষকদের জন্য পরামর্শ দেন।

হলুদ চাষ লাভজনক ‘সাথি ফসল’

পার্থসারথি রায়

হলুদ কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। মশলা ফসলের মধ্যে এটি অন্যতম। অন্যান্য ফসলের মতো হলুদ চাষেরও গুরুত্ব রয়েছে। তবে সাথি ফসল হিসেবে হলুদ চাষ বিশেষ লাভজনক। উচ্চফলনশীল বীজ এবং আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হলুদের ফসল স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি পাওয়া যায়।

কৃষি দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী উর্বর দোআঁশ মাটি হলুদ চাষের জন্য উত্তম। বেলে-দোআঁশ মাটিতেও হলুদ চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা যেকোনো মাটিতে হলুদ চাষ হতে পারে। একই জমিতে পরপর হলুদ চাষ করা উচিত নয়। বিভিন্ন ফলের বাগানের শুরুতে সাথি ফসল হিসেবে অনেক চাষিই হলুদ চাষ করে থাকেন। চৈত্র মাস হলুদ চাষের উপযুক্ত সময়। জমিতে কাণ্ড লাগাবার পূর্বে চাষ ও মই নিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয়। জৈব সার মিশিয়ে জমি তৈরি করতে পারলে ভালো হয়। সারিবদ্ধভাবে কাণ্ড রোপণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ২-৩ ইঞ্চি গভীরতায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং কাণ্ড থেকে কাণ্ডের দূরত্ব ১০ ইঞ্চি থাকা আবশ্যিক। রোগমুক্ত এবং পুষ্ট কাণ্ড বীজ শোধন করে নিয়ে জমিতে রোপণ করার বিষয়টি চাষিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কাণ্ড বীজের ওজন গড়ে ২০-৩০ গ্রাম ধরা হয়। কাণ্ড অঙ্কুরিত হওয়া থেকে চারাগাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খেতের আগাছা পরিষ্কারের পাশাপাশি পোকামাকড় গাছের ক্ষতি করছে কিনা সেদিকে সজাগ থাকা প্রয়োজন। বীজ রোপণের প্রায় দুই মাসের মাথায় উভয় সারির মধ্যিখানের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে ইউরিয়া কিংবা মিশ্রসার পরিমাণ মতো মেশাতে হবে। এরপর সার মিশ্রিত সেই মাটি গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়। সে সময় গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে। জমিতে সার মেশানোর বিষয়টি জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ার ৫০-৬০ দিনের মধ্যে খেতে সারের উপরিপ্রয়োগ প্রয়োজন বুঝে করা প্রয়োজন। হলুদখেতে জলসেচের প্রয়োজন হয়। শুষ্ক প্রকৃতির জমিতে মাঝেমধ্যেই জলসেচ দরকার হয়। কিন্তু রসালো জমিতে জলসেচ সেরকম প্রয়োজন হয় না। খেতে জল ছড়ানো ক্ষতিকর। তাই হলুদ খেতে জলনিকাশি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গাছের কাণ্ডে পোকার আক্রমণ এই ফসল চাষে প্রধান সমস্যা। এতে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পাতা হলদে হয়ে যায়। ফলে ফলন অনেকটাই কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে গাছের আক্রান্ত ডগা তুলে ফেলা হয়। প্রতি লিটার জলে ৪ মি.গ্রা. কীটনাশক মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে নিষ্কৃতি মেলে। ফসল লাগাবার ৯-১০ মাস পর গাছের পাতা শুকিয়ে এলে হলুদ সংগ্রহ করা যায়। কাঁচা হলুদ সংগ্রহ করার সময় শিকড়, পার্শ্ব শিকড় হলুদ থেকে পরিষ্কারভাবে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। এরপর ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে ২-৩ দিনের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এতে হলুদের গা থেকে জলীয়ভাব দূর হয়। এবার হলুদ সেদ্ধ করার উপযুক্ত হয়। সেদ্ধ প্রক্রিয়ার উপর হলুদের উৎকৃষ্ট রং নির্ভর করে। আর রংয়ের উৎকৃষ্টতার উপর অতিরিক্ত লাভ পাওয়ার বিষয়টি বেশ কিছুটা নির্ভরশীল তো বটেই।

জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মমতাজ বেগম হলুদ চাষ প্রসঙ্গ বলেন যে, প্রয়োজনের তুলনায় এই ফসলের চাষ খুবই কম হয়। এক্ষেত্রে তিনি চাষিদের উৎসাহ বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন। দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি এলাকার হলুদ চাষি চন্দ্রকান্ত বর্মন, প্রসন্ন বর্মন, উপাসনা মণ্ডল প্রমুখ জানান যে, এই ফসল প্রতি বছর চাষ করে তাঁরা বেশ লাভবান হয়েছেন। স্থানীয় চাষি সুভাষ রায় বলেন, ‘বাড়ির চারিদিকের পরিত্যক্ত জমিতে হলুদ চাষ করা আমার নেশা।’ ভালো ফলন হিসেবে বিঘে প্রতি ২০০০-২৫০০ কেজি কাঁচা হলুদ পাওয়া যায়। তবে সঠিক সময়ে রোপণ, সার, সেচ ও পরিচর্যা করলে ফলন বেড়ে যায়। চাষিদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী সাধারণ বাজারে হলুদ ১০০-১২০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হয়। প্রাত্যহিক রান্নার কাজে হলুদ অপরিহার্য। প্রসাধনী কাজে ও রংশিল্পে কাঁচামাল হিসেবে এর প্রয়োজন হয়। তাই চাহিদা অনুসারে জোগান অব্যাহত রাখার স্বার্থে হলুদের উৎপাদন বাড়াতে চাষিদের আগ্রহ বাড়ানো অবশ্যই জরুরি।